# শহীদুল্লা কায়সার
# অনালোচিত উপন্যাসের আলোকে

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) বাংলা উপন্যাসের প্রথম সারির রূপকারদের একজন হলেও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অন্যতম ট্রাজেডি হলো : তাঁর অপেক্ষাকৃত কম সফল উপন্যাস *সারেং বৌ* (১৯৬২)-এর জন্যই তিনি বাংলাভাষী পাঠকের কাছে অধিকতর পরিচিত; এবং শিল্পপ্রশ্নে শ্রেষ্ঠ কিন্তু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত *কবে পোহাবে বিভাবরী* (রচনাকাল ১৯৭১, *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী-৪*, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৯-এ অন্তর্ভুক্ত) খুব কম পাঠকের কাছেই পৌঁছেছে। অন্যদিকে বলা যায় মান ও প্রচার প্রশ্নে *সংশপ্তক* (১৯৬৫) সবচেয়ে বেশি সার্থক হলেও তাঁর উপন্যাসগুলোতে চোখ বুলালে এটি সহজেই যে কোন পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শহীদুল্লা কায়সার আধেয় প্রশ্নে যেমন অভিনবত্বের অনুসন্ধানী, আধারের নতুনত্ব সন্ধানেও তিনি ছিলেন সদাপ্রচেষ্ট।

পূর্বোক্ত *সারেং বৌ* এবং *সংশপ্তক* ছাড়া তাঁর অন্যান্য যে সকল উপন্যাস রচনাবলীতে পাওয়া যায় সেগুলো হলো :

১. *কৃষ্ণচূড়া মেঘ* : রচনাকাল ১৯৫৯। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত; তবে ১৯৭৪ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে অধুনালুপ্ত *বাংলার বাণী*-র সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত।

২. *দিগন্তে ফুলের আগুন* : রচনাকাল ১৯৬১। লেখক এক্সারসাইজ বুক-এর নামপত্রে প্রথমে উপন্যাসের নামকরণ করেছিলেন *অরণ্য সুবজে আকাশ নীলে* । উপন্যাসখানি কোথাও প্রকাশিত হয় নি বলে জানা যায়।

৩. *কুসুমের কান্না* : উপন্যাসটি লেখা শুরুর তারিখ ২৬ জানুয়ারি ১৯৬২। পাণ্ডুলিপির মলাটে প্রথম নামকরণ করা হয় *সমুদ্র ও তৃষ্ণা* । এ উপন্যাসটিও কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

৪. *কবে পোহাবে বিভাবরী* : লেখার সূত্রপাত ১৯৭১ সালের ০২ এপ্রিল। এ গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী পান্না কায়সার জানান :

> তাঁকে দেশত্যাগের কথা বললে তিনি বলতেন যে, মাতৃভূমি ছেড়ে যাবার কথা তিনি ভাবছেন না। বরং দেশে থেকে ভাল একখানি বই লেখার সুযোগ তিনি নেবেন। যেই কথা সেই কাজ। চতুর্দিকে হত্যা, ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ। তারি মধ্যে রাত জেগে জেগে উপন্যাসখানি লেখায় মনোনিবেশ করলেন। ভোর হবার সাথে সাথে পাণ্ডুলিপি মাটির তলায় পুঁতে রাখতেন কায়েতটুলির বাড়িতে। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থান থেকে পাণ্ডুলিপি উঠিয়ে নিয়ে আসতেন। এবং ডুবে যেতেন লেখার মধ্যে। এভাবেই বই ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[১]

১৯৭২ সালে ১৪ ডিসেম্বর দৈনিক *সংবাদ*-এ 'শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যায়' উপন্যাসটির একটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয়। পরবর্তীতে সন্ধানী প্রকাশনা থেকে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হবার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি।

*কৃষ্ণচূড়া মেঘ* শহীদুল্লা কায়সারের সফল ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা না হলেও এটিতে তাঁর অভিনবত্ব ও সুদূর কল্পনার পরিচয় মেলে। পাকিস্তানের স্বাধীনতাত্তোরকালে ১৯৪৯-৫০ সালের দিকে ঢাকার উচ্চবিত্ত কন্যা বিরজিসকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আখ্যান নির্মিত। উপন্যাসটিতে অন্য উপাদানগুলো পাঠক মনে দাগ না কাটলেও সমকালে পূর্ব পাকিস্তানে যে সামাজিক বিবর্তন তা স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়েছে এ গ্রন্থে।

তিন পর্বে বিভক্ত উপন্যাসটির দৈর্ঘ্য দু'শ পৃষ্ঠার বেশি। বনেদি পরিবারের মেয়ে কেন্দ্রিয় চরিত্র বিরজিসকে ঘিরে পুরো গল্পটি আবর্তিত : বিরজিসের জন্য পাত্র নির্বাচন এবং প্রায় আশি পৃষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানের কুশালগড়ের যুবরাজের আগমনে সে নির্বাচনের সমাপ্তি। উপন্যাসের বাকি অংশ চলেছে বিবাহিত বিরজিস-যুবরাজ দুঃখ-বিলাপ-আর ভ্রান্তি নিয়ে।

*কৃষ্ণচূড়া মেঘ* কুশালগড়ের যুবরাজ আসার পূর্ব পর্যন্ত একটি প্রতীকী প্রচেষ্টা হিসেবে সফলতার দিকে এগিয়ে গেলেও বিবাহোত্তর কালে সে অগ্রযাত্রা আর থাকে নি। প্রথম অংশটিতে উচ্চকিত ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক অবস্থা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরে আসা সংস্কৃতিবান মুসলিম সমাজের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের অনগ্রসরতা। শিল্পী নির্বাচনের এক প্রসঙ্গে বিরজিসের বন্ধু কামাল বলে :

> হা করে দেখছো কি? মোল্লারা বিধান দিয়েছে, শরিয়তের কানুন মোতাবেক রাজ্য চলবে। সরা-শরীয়তের বরখেলাফ সহ্য করা হবে না। সেদিন স্কুলের মেয়েদের বাসে পর্দা ছিল না বলে চকবাজার বড়ো মসজিদের সামনে এক গুন্ডা এক মেয়েকে জখম করেছে। খবর রাখো?[২]

পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে আর একটি বড় উপাদান ক্যাপ্টেন হাসান : যার দোর্দণ্ড উপস্থিতি সে-সমাজের প্রেক্ষাপটে শহীদুল্লা কায়সারের নজরে পড়েছিল। নিকট ভবিষ্যতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সামরিক শাসনের ইঙ্গিত কি ঔপন্যাসিক টের পেয়েছিলেন? তা না হলে উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই হাসান নামের সেই সামরিক অফিসারের উপস্থিতি কেন, কেন তার মোটর সাইকেল গাড়ি বারান্দায় এসে থামলে 'প্রচণ্ড আর্তনাদ' শোনা যায়।[৩]

শহীদুল্লা কায়সার বিরচিত পরবর্তী যে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রয়ে যায় তার নাম *দিগন্তে ফুলের আগুন* । স্মরণ করা যেতে পারে সমসাময়িক সময়েই তাঁর বহুল আলোচিত এবং বহু পুরস্কৃত উপন্যাস সারেং বৌ প্রকাশিত হয়। গঠনশৈলী প্রশ্নে *দিগন্তে ফুলের আগুন* বিশেষ মনোযোগের দাবিদার : কারণ এটি একটি পত্রোপন্যাস।

বাংলাভাষায় পত্রোপন্যাসের ধারাটি তত সমৃদ্ধ না হলেও ইংরেজি ভাষাতে উপন্যাসের শুরুরকাল থেকেই এটি একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। *Samuel Richardson* (১৬৮৯-১৭৬১)-এর তিনটি উপন্যাস রয়েছে যেগুলো পত্রোপন্যাস হিসেবে সমকালীন পাঠকের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। *Pamela* (১৭৪০-৪১), *Clarissa Harlowe* (১৭৪৭-৪৮) এবং *Sir Charles Grandison* (১৭৫৩-৫৪) নামের সে তিনটি উপন্যাস ছাড়াও ইংরেজিতে আরও যে সব পত্রোপন্যাসের উদাহরণ আমরা পাই সেগুলো হলো : Tobias Smollet (১৭২১-১৭৭১) এর *Humphry Clinker* (১৭৭১), Fanny Burney (১৭৫২-১৮৪০)-এর *Evelina* (১৭৭৮) এবং John Moore (১৭২৯-১৮০২)-এর *Mordaunt* (১৮০০) বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত পত্রোপন্যাসের তালিকায় রয়েছে Charles Swinburne (১৮৩৭-১৯০৯) এর *Love's Cross-Currents : A Year's Letters* (১৮৭৭)। আমেরিকান লেখক Johu Barth (জন্ম ১৯৩০)-এর *Letters* (১৯৭৯) উপন্যাসটিও সাম্প্রতিক সময়ের একটি প্রধান পত্রোপন্যাস। নরওয়ের ঔপন্যাসিক Jostein Gaarder এর *Sophie's World* -ও একটি সকল পত্রোপন্যাস হিসেবে উল্লেখের দাবি রাখে।

বাংলাভাষায় রচিত নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বসন্তকুমারের পত্র* (১৮৮২) প্রথম পত্রোপন্যাস হিসেবে ইতিহাসের পাতায় উল্লিখিত। পরবর্তীতে আরও যে পত্রোপন্যাসের উল্লেখ আমরা পেয়েছি সেটি হলো অম্বিকাচরণ গুপ্তের (১৮৫২-১৯১৫) *পুরানো কাগজ* বা *নথীর নকল* (১৮৯৯)। বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে সফল যে পত্রোপন্যাসটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রচিত প্রথম উপন্যাস *বাঁধনহারা* (১৯২৯)। *বসন্তকুমারের পত্র*তে মোট চারটি চরিত্র পরস্পরের মধ্যে পত্র বিনিময় করেছিল; যদিও *বাঁধনহারা*তে পত্র লেখকের সংখ্যা নয়। প্রথমটিতে পত্রসংখ্যা ১৯ হলেও দ্বিতীয়টি সেটি বরং ১টি কম। *দিগন্তে ফুলের আগুন* এর সমকালে আরও যে একটি পত্রোপন্যাসের সাক্ষাৎ আমরা পাই সেটি হলো সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) *রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ* (যদিও উপন্যাসটি প্রকাশ পায় ১৯৭১-এ)।

*দিগন্তে ফুলের আগুন* কলেবরের দিক দিয়েও ক্ষীণ : মাত্র ষাট পৃষ্ঠা মত। এতে পত্রলেখক দু'জন : রোকসানা এবং মুনির। জেলখানার মুনিরের সাথে রোকসানার পত্র বিনিময় ঘটেছে মোট ন'টি। যদিও মুনির রাজবন্দী হিসেবে জেলখানায় অন্তরীণ এবং সে মোট চারটি পত্রের লেখক ; কিন্তু উপন্যাসটি কোনক্রমেই একটি রাজনৈতিক উপন্যাস না হয়ে বরং একটি প্রেমের উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

তবে উপন্যাসটির প্রথম পত্রটির দৈর্ঘ্য তৈইশ পৃষ্ঠা যা অনেকখানিই অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব। এ পত্রটি পড়তে যেয়ে রিচার্ডসনের উপন্যাসের কথা বারবারই পাঠকের মনে পড়বে। নজরুলের *বাঁধনহারা*-র পত্রগুলো কিন্তু তুলনামূলকভাবে বাস্তবসম্মত। *বাঁধনহারা*-র দীর্ঘতম পত্রটি বারো পৃষ্ঠার এবং সেটির দৈর্ঘ্যর কারণও অন্যত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। রিচার্ডসনের দীর্ঘ পত্রগুলো নিয়ে সমালোচকের বক্তব্য :

> রিচার্ডসন যিনি ইংরেজি সাহিত্য পত্ররীতির উপন্যাসের প্রবর্তক, তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের বক্তব্য হলো তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের দেখে মনে হয় তারা যেন চিঠি লেখার বাতিকে (ম্যানিয়া) ভুগছে। ... 'স্যার চার্লস গ্রান্ডিসন' উপন্যাসের মিস বাইরন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেসলি স্টিফেন বলেছেন যে, ২২ মার্চ তিনি ছাপার অক্ষরে চৌদ্দ পৃষ্ঠার একটি চিঠি লেখেন। ঐ একই দিনে তিনি আরও দুটি চিঠি লেখেন ছয় ও বারো পৃষ্ঠার। পরের দিন আরও দু'খানা - যথাক্রমে আঠারো ও দশ পৃষ্ঠার। ২৪ তারিখে আরো দু'টো, সর্বসাকুল্যে ত্রিশ পৃষ্ঠার এবং এত লেখার পরেও সর্বশেষ তার সক্ষোভ মন্তব্য যে কলম নামাতে তাঁকে বাধ্য করা হলো।[৪]

তবে একক পত্রের দৈর্ঘ্য বিবেচনায় *দিগন্তে ফুলের আগুন*-এর ১ম পত্রটি যেটি রোকসানা লিখেছে সেটি পূর্ববর্তী সকল একক পত্রের দৈর্ঘ্যের চেয়েও দীর্ঘ।

*কুসুমের কান্না* উত্তম পুরুষে রচিত। ১৬০ পৃষ্ঠার অধিক দীর্ঘ এ উপন্যাসটি তুলনামূলকভাবে অধিক মনোগ্রাহী। একনিষ্ঠপাঠে *দিগন্তে ফুলের আগুন* যেমন পাঠকমনে আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে *কুসুমের কান্না*ও

তেমনি পাঠকমনে দিতে পারে অপার আনন্দ। উত্তম পুরুষের বক্তা সেলিমের ব্যক্তিক-পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনাবলী নিয়ে *কুসুমের কান্না* রচিত।

শহীদুল্লা কায়সার রচিত উপর্যুক্ত তিনটি উপন্যাস *কৃষ্ণচূড়া মেঘ, দিগন্তে ফুলের আগুন* এবং *কুসুমের কান্না* থেকে এমনটি সহজেই প্রতীয়মান হয় তিনি বিশাল কলেবরের আখ্যানকে উপন্যাসের আকারে ধরতে পারার মক্‌শো করে চলেছেন। *সারেং বৌ*তে তাঁর যে প্রচেষ্টা সেটি সফল হলেও দীর্ঘ একটি সময় বা এলাকার গল্প হিসেবে উপন্যাসটি কোন সার্থকতা দাবি করতে পারে না; যেমনটি *সংশপ্তক*-এর ক্ষেত্রে তাঁর প্রাপ্য হয়েছে। তবে সে-প্রাপ্তির মাঝখানে রয়ে গেছে তুলনামূলকভাবে কম সফল তাঁর তিনটি দীর্ঘ রচনা। তবে *সংশপ্তক* প্রকাশিত হলে পরই তিনি অনুধাবন করেন একটি সফল-সার্থক উপন্যাসের জন্ম। সময় এবং ইতিহাসের মিশেলে কাহিনী নির্মাণে তিনি যে আস্বাদ লাভ করেন তারই পরবর্তী প্রয়াস *কবে পোহাবে বিভাবরী* ।

*সারেং বৌ* এবং *দিগন্তে ফুলের আগুন* ব্যতিরেকে তাঁর আরও যে তিনটি দীর্ঘ উপন্যাস *কৃষ্ণচূড়া মেঘ, কুসুমের কান্না* এবং *সংশপ্তক* এদের প্রত্যেকটিতেই কাহিনীর ডাল-পালা যথেষ্ট বিস্তৃত। *সংশপ্তক* সে-বিস্তৃতির চূড়ান্ত ঘটিয়েও সফলতম এমনটিই বলা যায়। *সংশপ্তক*-এর বিস্তারের সাথেই বোধহয় কেবলমাত্র *কবে পোহাবে বিভাবরী*-র বিস্তারের প্রতিতুলনা চলে।

প্রায় তিনশ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসটির শুরুর প্রেক্ষাপট ঢাকা শহর। সময়টা ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ। উপন্যাসের প্রথম শব্দটিই 'বুম' যা ২৫ মার্চ কালো রাত্রির চিত্রকে মুহূর্তেই উপস্থিত করে পাঠকের সামনে। সামান্য দেড় পৃষ্ঠার প্রথম পরিচ্ছেদেই অনেকগুলো চরিত্রকে পরিচয় করানো হয়েছে। এভাবে উপন্যাসের কাহিনী যত সামনের দিকে এগিয়েছে একটি পরিবারের ঐ চরিত্রগুলো ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে দূর দূরান্তে।

কাহিনী শুরুর দিনটি অর্থাৎ ২৫ মার্চ বৃদ্ধ দাদু হাসিব চৌধুরী এবং দাদী আয়সা বেগমের বিয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী।সেখানে মিলিত হয়েছিল বৃদ্ধ দম্পতির পাঁচ ছেলে ও নাতি নাতনীগুলো। তৃতীয় প্রজন্মের এই মানুষগুলোই বর্তমানে যৌবনে উপনীত : রাজনীতি সমাজনীতি এবং হৃদয়নীতির সাথে এদেরই সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশি। উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের অধ্যায় সংখ্যা ছেচল্লিশ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ছত্রিশ। পৃষ্ঠাসংখ্যা কমবেশি হলেও প্রায় কাছাকাছি।

*কবে পোহাবে বিভাবরী* উপন্যাসে শহীদুল্লা কায়সারের প্রধান কৃত্য হলো তিনি তাঁর এ উপন্যাসে চরিত্রগুলোকে ক্রমে ক্রমে সাধারণ জীবন থেকে নিয়ে গেছেন যুদ্ধ জীবনে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হয়ে চলে যুদ্ধসময়ে এবং শহীদুল্লা কায়সার অত্যন্ত সুকৌশলে বিশাল এই প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে চলেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে এ বিশাল ক্যানভাসে আর কোন কথাসাহিত্যিক বোধ করি চিত্রণের চেষ্টা করেন নি। এবং পুরো ব্যাপারটি উপস্থাপিত হয়েছে দুটি অবস্থান থেকেই : পারিবারিক তথা ব্যক্তিগত অবস্থান এবং যুদ্ধকালীন অবস্থান। ঔপন্যাসিক এ কাজটি করতে যেয়ে যেমন আওয়ামী সমর্থক সুমনকে তুলে এনেছেন তেমনি মস্কোপন্থী রূপাকে চিত্রিত করতেও ভোলেন নি। এসেছে আওয়ামী-বিরোধী শামীমও। এভাবে বহু দলমতের মানুষকে একটি প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক।

*কবে পোহাবে বিভাবরী* একটি সর্বজনীনতা অর্জন করতে শুরু করে ২০ অধ্যায়ের দিকে যখন ঢাকা শহরে পাকিস্তানী আক্রমণে বিধ্বস্ত মানুষগুলো বুড়িগঙ্গা নদী পাড় হয়ে ওপারে জমা হতে শুরু করে। এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রতি-যুদ্ধের ভাবনা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চিন্তা মাথায় আসতে থাকে। বিশাল জনগোষ্ঠীর এই বিবরণ আমরা পাই :

> তিনদিন পর অনূপ ফিরে এল যেখান থেকে রওনা হয়েছিল সেখানে। তখন সন্ধ্যা, অনূপের কাছে সহসা মনে হয় জায়গাটা একেবারেই অচেনা। রাস্তায় গাছের তলায়, মাঠে লোক আর লোক। অজস্র নরনারী। কেউ উনুন জ্বালিয়ে রান্নায় বসেছে। কেউ উন্মুক্ত মাঠে খড় বিছিয়ে কিংবা কলাপাতা বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছে। ছেলে, বুড়ো, শিশু তরুণ-তরুণী কে কোন পরিবারের বুঝবার উপায় নেই। যে যেখানে পারছে ডেরা ফেলছে। মাঝে মাঝে ভলান্টিয়াররা মাটির মটকায় পানি ঢেলে খাচ্ছে। যার যা প্রয়োজন ভাগ করে নিয়ে খাচ্ছে। দোকান ঘরগুলো মানুষে ভর্তি। কৃষকের বাড়িগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। রাস্তার দু'ধারে এক মাইল ধরে শুধু মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।[৫]

ঔপন্যাসিক একটি পরিবারের কিছু মানুষকে নিয়ে যে কাহিনী-নির্মাণ শুরু করেছিলেন সময়ের দাবিতে সে-মানুষগুলো মিশে গেছে পুরো দেশের জনগোষ্ঠীর সাথে। শুরুর অধ্যায়ের কান্তা, অনুপ, শুভ, সুমন, শামীম, কলি, রূপা, তুহিন সময়ের অগ্রসরণের সাথে সাথে বৃহত্তর জনমানুষের সাথেও সম্পৃক্ত।

শহীদুল্লা কায়সার *কবে পোহাবে বিভাবরী*তে মুক্তিযুদ্ধকে পবিত্রায়ণ করতে চান নি; বরং চেয়েছেন সামগ্রিক একটি প্রেক্ষাপট সৎ শিল্পীর দৃষ্টিতে ধারণ করতে। আর সে কারণেই যুদ্ধে আগ্রহী মানুষদের মধ্যেও অসৎ মানুষকে চিত্রিত করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। যেমনভাবে হাসিব চৌধুরীর বাড়িতে পাকিস্তানী মেজরের খবরদারীও তিনি চিহ্নিত করেছেন একই তুলিতে। বড় ছেলে হামিদ চৌধুরীকে ঐ মেজর গুলি করে হত্যা করার পর অন্য ছেলে হাবিব চৌধুরী যখন হাসিব চৌধুরীকে কবর খোঁড়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন হাসিব চৌধুরীর উত্তর :

> খবরদার। কবরের কথা বলবে না। আমি ওকে কবর দেব না। আমি ওর দেহটাকে নিয়ে বসে থাকব। ওর দেহটা যখন পচে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন ওর হাড়গুলো নিয়ে আমি এভাবে বসে থাকব যতদিন আমি বাঁচি।[৬]

এভাবেই সামগ্রিক একটি চিত্র তুলে আনেন ঔপন্যাসিক। ব্যক্তিক থেকে পারিবারিক হয়ে সে চিত্র মিলেমিশে যায় জাতিগততেও। আবার সমগ্র জাতির হয়ে সে চিত্র এসে মেশে ব্যক্তিক এক অবস্থানে। 'তিরিশ হাজার মানুষ রাতের আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অনেকেই চলে গেল সোজা পথ ধরে, কেউ বা খাল পেরিয়ে মেঠো পথে। কিন্তু যারা গেল, এল তার অনেক বেশি'[৭] - সেই যে বিশাল জন-কোলাহল এর ভেতরেই :

> প্রসব বেদনায় কাতর মহিলাটি আর্তনাদ শোনা গেল। ... রাস্তার উপরে হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে বাচ্চা ধরতে হচ্ছে, নৌকার গলুইর উপর বসে মা সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসতে না বসতেই বাচ্চা বেরিয়ে আসছে। এ কিসের আলামত।[৮]

লক্ষ করা যেতে পারে যে *কবে পোহাবে বিভাবরী*-তে ঔপন্যাসিক মোট তিনটি স্থানকে বেছে নিয়েছেন তাঁর কাহিনীর প্রেক্ষাপট হিসেবে : ব্যাপকভাবে ঢাকা শহর, বুড়িগঙ্গা পাড়ের জায়গাটি যেখান দিয়ে লাভ লাভ ঢাকাবাসী অতিক্রম করেছে এবং শেষটি হলো চট্টগ্রাম। ঢাকা শহরটিকে কিন্তু শুধু হাসিব চৌধুরীর পরিবারের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি, ক্রমে ক্রমে তার প্রসারণ ঘটেছে এবং পাকিস্তানী বাহিনীর নির্যাতনকে পরিস্ফুট করতে লেখক সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। সেখানে কলির প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যাপকতায়; যেমনভাবে বিহারী ইকবাল মির্জাও একটি প্রধান চরিত্র হয়ে পরিস্ফুটিত। এই ইকবাল মির্জাই একবার মেজরকে বলেছিল :

> দু'হাজার তিনশ বছর আগে যে দেশে তোমার আমার জন্ম সেই পঞ্চনদের দেশে আলেকজান্ডার সাহেব তিরিশ সহস্রাধিক সৈন্য নিয়ে ছাউনী ফেলেছিল। আসিরীয়, পারসিক, গ্রীক সব দেশের তাগড়া জোয়ানদের নিয়ে গঠিত ছিল এই বাহিনী। ইতিহাস বলে সিন্ধু নদীর তীরে তারা তিনটি বসন্ত কাটিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই বসন্তগুলো তারা বিজয়ী বাহিনীর মত প্রাণভরে উপভোগ করেছিল যেমন তুমি বলছ। এই মুহূর্তে আমি দ্বিধাহীন হলাম তুমি, আমি দু'হাজার তিন'শ বছর আগেকার সেই অর্ধেক বসন্তের ফল।[৯]

বিহারী ইকবাল মির্জার এ ভাবনার ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক একটি সত্যে উপনীত হতে চান, সন্দেহ নেই। এই বিহারী লোকটি হৃত কলিকে খুঁজে পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। অথচ চট্টগ্রামে শুধুমাত্র বিহারী হওয়ার কারণেই একদল নির্দোষ নারী-শিশুকে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই।

ঢাকায় অত্যাচারিত নির্যাতিত বাঙালি যেন যূথবদ্ধ বুড়িগঙ্গার পাড়ে। আর সেই যূথ প্রতিশোধের পণে মরিয়া চট্টগ্রামে। কলির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর অনেক হন্যে হয়েও তুহিন যখন কলিকে পায় না তখন :

> বড় চাচার কবরের সামনে দাড়িয়ে তুহিনের অন্য কথা মনে হয়। মনে হয় কলিকে খুঁজে বেড়াবার অর্থ হয় না। এক কলিকে খুঁজে ও কি করবে? সহস্র কলি আজ গৃহহারা, লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা। এ অবস্থায় একটি কাজই তো করার আছে। বড় চাচার মত লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ নরনারীকে যারা হত্যা করেছে, কলির মত মেয়েদের যারা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, যারা দেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে।[১০]

তুহিনের এই চেতনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে যখন সে বোঝে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নিশ্চয়তাহীন জীবনে কোন একজন বিশেষ মানুষ বা একটি পরিবারের কথা চিন্তা করা অমার্জনীয় স্বার্থপরতা। আর তুহিনের এই চেতনা থেকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

একটি বিশাল প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন শহীদুল্লা কায়সার; শেষ তিনি করে যেতে পারেন নি তবে যেটুকু করে গেছেন সেটুকু হয়ে আছে মূল্যবান এক দলিল। উপন্যাসের শেষে যেয়ে পাঠকের মনে হতে বাধ্য যে ঔপন্যাসিক শুধু বিশাল প্রেক্ষাপটকেই ধারণ করতে চান নি, বরং সে প্রেক্ষাপটের মানুষগুলো কীভাবে তাদের ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনকে অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে জাতীয় জীবনের এই যুদ্ধে অংশীদারী হয়েছে সেটির চিত্রায়ণই সম্ভবত লেখকের মূল অভীপ্সা।

তথ্যসূত্র :


০১. দ্রষ্টব্য : তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থ-পরিচয়, *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, সম্পা. গোলাম সাকলায়েন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৫১৪

০২. *কৃষ্ণচূড়া মেঘ, শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, সম্পা. গোলাম সাকলায়েন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২১

০৩. তদেব, পৃ. ৫৪

০৪. অভিখ ভট্টাচার্য, *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য* (সম্পা. আলোক রায়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৩, (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৩০-৩১

০৫. *কবে পোহাবে বিভাবরী, শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

০৬. তদেব, পৃ. ১২৬

০৭. তদেব, পৃ. ১০৪

০৮. তদেব, পৃ. ১২১

০৯. তদেব, পৃ. ১৫৯

১০. তদেব, পৃ. ২৩৩